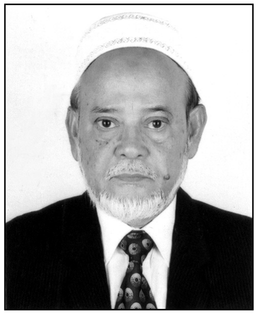

সৈয়দ মহীউদ্দিন
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ
ও
বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সংহতি পরিষদ

প্রকাশক :

প্রকাশনায় :
এস কে প্রিন্টার্স
ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ :
১ নভেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ : মোঃ জাবেদ আলী সরকার

স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ও মেজর জিয়ার অবস্থান

- **বৈষম্য**
- **৬-দফা**
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা**
- **মুক্তিযুদ্ধ**
- **বাংলাদেশ**

সৈয়দ মহীউদ্দিন
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ
ও
বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সংহতি পরিষদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনো বাংলাদেশের জনগণের কাছে সর্বজন স্বীকৃত জাতির পিতা হতে পারেন নি। এটা আমাদের জন্য শুধু দুঃখ জনকই নয় বরং খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

আমার মূল্যায়নে এর জন্য রাজনৈতিক বিদ্বেষ যতটুকু দায়ী তার চেয়েও বেশী দায়ী বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর অবদান কি ছিল বা কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে নতুন প্রজন্মসহ অনেকেরই সম্যক ধারনা ও চর্চার অভাব রয়েছে।

অনেকে মনে করেন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ ১৯৭১ হঠাৎ করে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তাতেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

এসব বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্বাধীন করার পটভূমিতে কার কতটুকু অবদান রয়েছে তা মূল্যায়ন করে দেখার জন্য এ লেখায় উল্লেখযোগ্য কতিপয় তথ্য উপস্থাপন করা হল।

ইসলাম তথা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। এর বহিঃপ্রকাশ প্রথম ঘটে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী যখন পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সাংসদ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দ্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাকে দাবী করেন। সাথে সাথেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন প্রায় একযোগে এর বিরোধিতা করেন। বাংলাভাষা দাবী করার অপরাধে ১১ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা শহরে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশ বেপরোয়া নির্যাতন চালায়। প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামছুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। পরে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। অথচ ভাষা ভিত্তিক জণসংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলতো। এদের সকলেই ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী।

এরপর ১৬ মার্চ ছাত্ররা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ঘেরাও করে। এর ৪ দিন পর - পাকিস্তানের জাতির পিতা ও গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মদআলী জিন্নাহ এক সফরে ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় তিনি একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা দেন। এর পরবর্তী ঘটনাবলী সকলেরই কম-বেশী জানা আছে বিধায় ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখতে চাইনা। শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানী ওপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রামের সূচনা করেছিল।

ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র ছিল আরো ভয়াবহ। ১৯৫৬-৬০ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল একশত (১০০/=) টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল একশত বত্রিশ (১৩২/=) টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় দাঁড়ায় ১৪২/= টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ২২৩/= টাকা।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যছিল আরো বেশী। পূর্ব পাকিস্তানে মূল ধাতব ও বৈদ্যুতিক শিল্প যেখানে ছিল ২%, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৯৮%। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৫ ভাগ, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৯৫ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানে কাপড় শিল্প ছিল ২২ভাগ আর ৭৮ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র ২২টি পরিবার জাতীয় শিল্পের ৬৬ভাগ, বীমা কোম্পানীর ৭৯ ভাগ এবং ব্যাংকিং শিল্পের ৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো।

"সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" এই শিরোনামে আওয়ামী লীগের সেদিনকার একটি পোষ্টার নিপীড়িত বাংগালী জাতিকে চরমভাবে নাড়া দেয়। এই পোস্টারে দেখানো হয়েছিল রাজস্ব খাতে পূর্ব-পাকিস্তানে যেখানে ব্যয় হতো ১৫০০ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে এর পরিমাণ ছিল ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো ৩০০০/= কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যের ২০ ভাগ খরচ হতো পূর্ব পাকিস্তানে, আর ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে শতকরা ১৫ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, বাকী ৮৪ জন পশ্চিম পাকিস্তানের। সামরিক বিভাগে ১০ জন পূর্ব পাকিস্তানের, বাকী ৯০ জন পশ্চিম পাকিস্তানের। উল্লেখ্য যে চাকুরিতে পূর্ব পাকিস্তানের কোটায় কম করে হলেও শতকরা ৫ ভাগ ছিল বিহারী অর্থাৎ অবাংগালী।

ধর্মের বাঁধন সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও অসামরিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বাংগালিদের ঘৃনা ও ক্রোধ বৃদ্ধির আরো যথোপযুক্ত কারণ ছিল। কেন্দ্রীয় বৈদেশিক নিয়োগ ৮৫ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের, ১৫ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তানের, সেনাবাহিনীতে জেনারেল পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ছিল ১৬ জন, পূর্ব-পাকিস্তানের ছিল মাত্র ১ জন। নৌ-বাহিনীতে বাঙালী ছিল শতকরা ৯ ভাগ, বিমান বাহিনীতে ১১ ভাগ, পিআইএ, বা পাকিস্তান এয়ার লাইনস-এ বাঙালি ২৮০ জন আর পশ্চিম পাকিস্তানের ৭০০০ (সাত হাজার) জন। এই ধরণের শোষন আর বঞ্চনার উপর ভিত্তি করেই পূর্ব-পাকিস্তানে গড়ে উঠে শাসক আর শোষক-বিরোধি গণঅসন্তোষ।

এরই এক সময়ে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্রকরে যুদ্ধ বেধে যায়। ১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে রাশিয়ার অন্তর্গত তাসখন্দ শহরে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চুক্তির পক্ষে ছিলেন না। তাই তাসখন্দ থেকে ফিরে এসেই তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং আইয়ুব বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন। এ কারণে তাকে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়। বেশ কিছুদিন জেলখানায় থাকার পর তিনি ছাড়া পান। এর পর পরই রুটি, কাপড়া আউর মাকান (অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান) স্লোগান দিয়ে তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দলের নামকরণ করা হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি। সংক্ষেপে পিপিপি। পশ্চিম পাকিস্তানে এ দলটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এই সময় 'তাসখন্দ চুক্তির ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতির কারণে পাকিস্তানের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য আইয়ুব বিরোধী মূল রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনের ডাক দেন। এতে সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। কিন্তু চীনপন্থী মওলানা ভাসানী এ সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকেন। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে ভাসানীর প্রতি চীনের নির্দেশ 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' নীতি এর মূল কারণ ছিল।

এই সম্মেলনে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে জ্বালাময়ি বক্তৃতা করেন তাতে অন্যান্য সকল দলের নেতৃবৃন্দ একেবারে হতবাক হয়ে যান। আওয়ামী লীগ নেতার মূল কথা ছিল ১৭ দিন পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১২শ' মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান সম্পুর্ণভাবে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের এই অরক্ষিত এতিম অবস্থার নিরসনের জন্য তিনি ৬-দফা দাবি সম্মেলনে পেশ করেন এবং দলমত নির্বিশেষে সকল নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে ৬-দফা দাবি সমর্থণ করার আহ্বান জানান। শুরু হয়ে যায় হৈ-হুল্লোড়। ন্যাপসহ উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতার মুখে উপায়ন্তর না দেখে শেখ মুজিব দল-বলসহ-সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেন। এর পর

অবস্থা এমন দাড়ায় যে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। প্রায় এক সপ্তাহকাল তারা লাহোরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। পরে শিল্পপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন তাদের জন্য প্লেনের টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) তাঁরা লাহোর থেকে দেশের পথে রওয়ানা হন। লাহোর বিমানবন্দের উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব ৬ দফা ও তাঁর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ৬-দফাকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগন তথা বাঙালি জাতির একমাত্র মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব বুঝেছিলেন সরকার এবং সকল বিরোধী দলের বিরোধিতার মুখে তিনি বেশিদিন জেলের বাইরে থাকতে পারবেন না। তাই লাহোর থেকে ফিরে আসার পরপরই তিনি ৬-দফার পক্ষে-দুর্বার-আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিরাম সফরসূচির মাধ্যমে ব্যাপক জনসংযোগ শুরু করেন। পূর্নোদ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় বিরাট বিরাট জন সমাবেশ করে ৬-দফা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকেন। অপরাপর বাম ও ডানপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ পরিস্থিতি বুঝে ওঠার পূর্বেই বাংলার মানুষ মনে-প্রাণে ৬-দফাকে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে।

ইতোমধ্যে "আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী" নামে ৬-দফার একটি প্রচার পুস্তিকা প্রায় সকল বাঙালির ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া হয়। এ ছাড়াও এর একটি ইংরেজি ভার্সন প্রতিটি দেশি-বিদেশি প্লেন যাত্রীর হাতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে অকাট্য যুক্তি সম্বলিত ৬-দফার প্রচার পুস্তিকা পৌছে যায়।

বাঙ্গালি জাতির কাছে ৬-দফা ও তার ব্যাখ্যা দানের জন্য শেখ মুজিব মাত্র পাঁচ সপ্তাহ জেলের বাইরে ছিলেন। ৬-দফার কাছে পাকিস্তানি সুবিধাবাদীদের ধর্মীয় স্লোগান "ইসলাম খাৎরেমে হ্যায় বা ইসলাম বিপদাপন্ন" আর বামপন্থীদের মার্কসীয় ব্যাখ্যা তলিয়ে যায়। সে ছিল এক অভূতপূর্ব অবস্থা।

এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান যে সব জেলায় শেখ মুজিব সভা করেছিলেন সে সব জেলা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার নির্দেশ দেন। ১২টি জেলা থেকে ১২টি হুলিয়া জারির ফলে তিনি বিভিন্ন জেলায় গ্রেফতার ও আদালত থেকে জামিন পেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়নগঞ্জ জনসভা শেষে বাসায় ফিরলে গভীর রাতে (রাত তখন একটা) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ডিপিআর অর্থাৎ ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলের ৩২ নং ধারায় ধাননমন্ডির ৩২ নং রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের প্রায় অটশ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে জীবিত আছেন শেখ শহিদুল ইসলাম, শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

শেখ মুজিবকে প্রথমে দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করলেও পরে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১নং আসামি করা হয়। এই মামলার অব্যক্ত বা পরোক্ষ মূল কারণ ছিল ৬-দফা কর্মসূচী।

হয়ত অনেকেই ভুলে গেছেন, আবার নতুন প্রজন্মের অনেকেরই জানা নেই যে প্রকৃত ৬-দফা দাবিগুলো কি কি ছিল। তাই আমি সবার জ্ঞাতার্থে ৬-দফা দাবিনামা এখানে তুলে ধরলাম ঃ

ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবিনামা–

প্রথম দফা

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দ্বিতীয় দফা –

ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার– এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় এষ্টেটসমূহের অর্থাৎ প্রদেশসমূহের হাতে থাকিবে।

তৃতীয় দফা–

দুইটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে–

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক-অথচ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না–আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুই স্বতন্ত্র "এস্টেট ব্যাংক" থাকিবে। অথবা (খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু শর্ত থাকে যে, শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে– যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে– দুই অঞ্চলের দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চতুর্থ দফা–

সকল প্রকার ট্যাক্স , খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের জন্য আঞ্চলিক আদায়কৃত রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে অটোম্যাটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

পঞ্চম দফা–

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে ঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশীয়জাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের ও বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করার, অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

ষষ্ঠদফা–

পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র করাখানা স্থাপন এবং নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষিবাহিনী গঠন করিতে হইবে।

৬-দফাকে অনেক বড় বড় দলের নেতারা "চমকপ্রদ ফানুস" মনে করলেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ছয় দফাকে অশনি সংকেত হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভয়ে তিনি হুংকার ছেড়ে ছিলেন এই ভাষায় যে "The

language of Weapon will answer the demands of shaikh Mujb" এদিকে গভর্ণর মোনায়েম খান একই সুরে সদম্ভে বলেছিলেন আমি যতদিন গভর্ণর থাকব ততদিন শেখ মুজিবকে জেলেই পচতে হবে। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার পর এর প্রমাণ তারা নিষ্ঠুরভাবে দিয়েছিলেন। তবে অত্যাচার-নিপীড়ন যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই ৬-দফা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ-হিসেবে বাঙালিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল।

এ অবস্থা চলাকালীন ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা দেয়া হলো যে, সামরিক ও বেসামরিকসহ মোট ২৮ জনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা সবাই বাঙালি। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের সর্বত্র বাঙালির জাতির মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো।

এমনি মুহূর্তে রহস্যজনকভাবে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারী ভোর রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হল। কিন্তু তিনি জেল গেটের বাইরে এসে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই ১টি সামরিক বাহিনীর জীপ তার সামনে এসে হাজির হল। তার মধ্য থেকে একজন সামরিক অফিসার নেমে শেখ মুজিবের সামনে এসে বল্ল, 'আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' শেখ মুজিব গ্রেফতারি পরওয়ানা দেখতে চাইলে অফিসারটি জানায় 'তার আর দারকার হবে না।'

এ ঘটনার পর কয়েক মাস পর্যন্ত দেশবাসী এমনকি শেখ মুজিবের পরিবারের কেউ-ই জানতে পারল না যে শেখ মুজিব জীবিত আছেন কি না। আর জীবিত থাকলেও কোথায় আছেন। পরে ১৯৬৮ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের এক ঘোষনায় বলা হলো যে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার এক মামলা দায়ের করেছে। ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত ২৮ জন বাঙালির সাথে আরও ৭ জনের নাম যোগ করা হয়েছে। এদের অন্যতম হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে দীর্ঘ ২০ মাস ১০ দিন আটক থাকার পর ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি হতে যে শেখ মুজিবের কোন হদিস পাওয়া যায়নি, ১১ এপ্রিল ১৯৬৮ তারিখে ঘোষিত আসামির তালিকার এক নম্বরে তার নাম দেখে দেশবাসী জানতে পারল যে, তাদের প্রাণ-প্রিয় নেতা শেখ মুজিব জীবিত আছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারল না যে তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন।

দায়েরকৃত দেশদ্রোহিতা মামলার অফিসিয়াল নাম "পাকিস্তান রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য। চলিত কথায় এর নাম "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।" এই মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পশ্চিম পাঞ্জাবের এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হলো। আদালত বসেছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে।

এই সময়ে আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মীসহ প্রায় আটশ' (৮০০) জন কারাগারে আটক থাকায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের অভাব দেখা দিল। ঠিক তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানের জন্য এগিয়ে এলো। যে সকল ছাত্রনেতা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন–

(১) তোফায়েল আহমেদ– সভাপতি, ডাকসু। (ছাত্রলীগ)

(২) নাজিম কামরান চৌধুরী– সম্পাদক, ডাকসু। (এন, এস, এফ)

(৩) আব্দুর রউফ– সভাপতি, ছাত্রলীগ।

(৪) খালেদ মোহাম্মদ আলী– সভাপতি, ছাত্রইউনিয়ন।

(৫) সাইফুদ্দিন– সভাপতি, ছাত্রইউনিয়ন।

(৬) মোস্তফা জামাল হায়দার– সভাপতি, ছাত্রইউনিয়ন।

(৭) সামসুদ্দোহা– সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন।

(৮) দীপা চৌধুরী – সহ সম্পাদিকা, ছাত্র ইউনিয়ন।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে উল্লেখিত ছাত্র নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত ১১ দফা দাবির প্রচারপ্রত্র বিলি হতে শুরু করে। ১১ দফার মধ্যে কয়েটি বাদে বাকী সবই ছিল শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবি।

এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালেরর ২৭ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সরকার পক্ষের শুনানি শেষ হয়। অপর দিকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে ছাত্রদের ১১ দফা দারুণ ভাবে সাড়া জাগিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে ৬-দফার কারনে, দায়েরকৃত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রতিদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকল। এর পেছনে সরকারের মুল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই মামলার দরুন বাঙালি মাত্রই শেখ মুজিব ও তার অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাবে। কিন্তু বাস্তবে পুরো ব্যাপারটাই সরকারের বিপক্ষে ব্যুমেরাং হয়ে গেল। আসলে বাঙালি জাতির মন-মানসিকতার মূল্যায়ন করতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও তার পরামর্শদাতারা মারাত্মক ভুল করেছিল। ৬-দফার প্রতি বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গণরোষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ঠিক সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তান এমনকি খোদ পাঞ্জাবেও আইয়ুব বিরোধীরা সোচ্চার হয়ে উঠল।

পরিস্থিতি মূল্যায়নে জননেতা মওলানা ভাসানী এ সময় “চীনের ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব” নীতি পরিহার করে বাঙালিদের গণদাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে আইয়ুব মূলতঃ এখন ডেড হর্স। ১৯৬৮ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকা আগমন করলেন। ওদিকে সেদিনই বিকেলে মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় জনগনের দাবি ৬-দফার পক্ষে ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সমর্থনে এক উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কে পদত্যাগ করে জনগনের দাবি মেনে নেয়ার জন্য জোর আহ্বান জানান। জবাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব চিরাচরিত ভাষায় ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে কঠোরভাবে হুসিয়ারি উচ্চারণ করলেন যে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভা করে বর্ত্তমান সরকারকে টলানো যাবে না। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি বিপরীত রূপ ধারণ করতে থাকে। প্রতিদিন অপ্রতিরোধ্য বিক্ষোভের এক পর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সামসুজ্জোহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এর ফলে আগুনে পেট্রোল ঢালার মতো অবস্থা হলো। আইন-শৃঙ্খলার এমন অবনতি হলো যে, ১৪৪ ধারা, কারফিউ, নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, কোন কিছুই জনরোষকে দমন করতে সমর্থ হলো না।

এরই এক পর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী জানা গেল যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠকের জন্য আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবসহ সব দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানিয়েছেন। সবার মনে ধারণা জন্মাল যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবার প্রত্যাহার করা হবে এবং শেখ মুজিবসহ সবাইকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় আশা ভঙ্গের কারনে জনতার মনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার মোটেও আন্তরিক নয়। এর ফলে গণঅসন্তোষ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। সরকারের পক্ষে বিরামহীন কারফিউ, গুলি, ধরপাকড় করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবনতিশীল পরিস্থিতির এই পর্যায়ে সত্য-সত্যই এবার প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের যোগদানের আমন্ত্রন লিপি নিয়ে একজন বিশেষ দূত ঢাকায় পৌছে। তার প্রস্তাবছিল শেখ মুজিব গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হলে তাকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে। এই প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে দুই ধরনের মতামত

আসে। কিছু সিনিয়র নেতার অভিমত ছিল এই যে, বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্মাদক জনবা তাজউদ্দিন আহমদ এবং অপেক্ষকৃত তরুণ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন।

পরিস্থিতি যখন এমন, ঠিক সেই সময় বেগম ফজিলাতুন্নেছা কুর্মিটোলায় আটক তাঁর জীবন সঙ্গী শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি শেখ মুজিবকে বল্লেন যে, "আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু মামলার অন্যসব আসামিদের রেখে আপনি যদি পিন্ডিতে যান, তাহলে আমি বটি দিয়ে নিজেই খুন হবো।"

আবার তাজউদ্দিন আহমদ শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ মর্মে জানালেন, "মুজিব ভাই, পূর্ব বাংলার ভয়াবহ আন্দোলনের দরুন আইয়ুব খানের গদি এখন টলমল। এ জন্যেই গোলটেবিল বৈঠকে আপনি না গেলে বৈঠক হবে না। তাই এই হচ্ছে মোক্ষম সময়। মামলা প্রত্যাহার এবং সমস্ত আসামির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকে আপনার যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয়া এখন সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। আর এক্ষেত্রে আমরা আন্দোলনকে আরও ভয়ংকর করে তুলবো। পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারন নিরস্কুশভাবে এখন আমাদের সপক্ষে সোচ্চার হয়েছে।

অবশেষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিশেষ দূতকে জানিয়ে দেয়া হল যে, আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে মুক্তি দেয়া না হলে শেখ সাহেবের পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে কোনও অবস্থায়ই যোগদান করা সম্ভব নয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকার অবস্থা চরম আকার ধারণ করল। চারদিকে শুধু মিছিল আর মিছিল। গগনবিদারী স্লোগান "জেলের তালা ভাঙব- শেখ মুজিবকে আনব"। এদিকে ঢাকায় জোর গুজব ছড়িয়ে পরলো যে, পাচ লাখ লোকের এক বিরাট মিছিল জেলের তালা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেলে শাহিন স্কুলের মোড়ে মাইক লাগিয়ে ঘোষণা দেয়া হলো যে, পরদিন শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে। ২২ তারিখের সংবাদপত্রে জানাগেল যে, শেখ মুজিব সহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সব আসামিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং মামলার প্রত্যাহার করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন।

২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রোবাবার অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজন করা হলো শেখ মুজিবের জন্য গনসংবর্ধনা। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। শুধু মানুষ আর মানুষ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোয়ফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম জনসভা। প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতায় তিনি ৬-দফার ব্যাখ্যা দান করলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের দাবি তুলে ধরবেন। আসলে কিন্তু বামপন্থীদের কথা ছিল মওলানা ভাসানীর পথ ধরে শেখ মুজিবকেও আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিতে হবে। সাথে সাথে ছাত্রদের ১১ দফা বাঙালিদের মূল দাবি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী এই সভায় বিপুল করতালি মধ্যে সভার সভাপতি তোফায়েল আহমদ জনগনের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব কে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। যদিও অদ্যাবধি এই দিনটি পালন করা হয়নি। আমার মতে এই দিনটি বাঙালিদের একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটিকে দলমত নির্বিশেষে সকল বাঙালিরই পালন করা উচিত। অন্তত ছাত্রদের তো উচিত তাদের দ্বারা ভূষিত দিনটিকে স্মরণে রাখা।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির অপর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। রেসকোর্স ময়দানে গনসম্বর্ধনা শেষে শেখ মুজিব তার গুরু মওলানা

ভাসানীর সংগে দেখা করতে বর্তমান বাংলা মটরে ন্যাপের কোষধ্যক্ষ জনাব সাইদুল হাসানের বাসায় যান। গুরুকে কদমমুচি করতে গেলে মওলানা ভাসানী তার মজিবর মিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর্শির্বাদ করেন। এর পর গুরু-শিষ্যের মধ্যে রাজনৈতিক কথা-বার্তা শুরু হয়। মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বলেন। বঙ্গবন্ধু বল্লেন যে, তিনি যেহেতু ওয়াদা করেছেন, সেহেতু ওয়াদা তিনি রক্ষা করবেন। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। গুরু যা চাচ্ছেন তা তিনি ৬-দফা দিয়েই পূরন করবেন। দুই নেতার কথাপোকথন এরূপ ছিলঃ

মওলানা ভাসানী ঃ আইয়ুব তো এখন মরা লাশ, সেখানে যাইয়া কি হবে?

বঙ্গবন্ধু ঃ তা'হলে লাশের জানাজা পড়তে দোষ কি? আপনি দোয়া করবেন।

উল্লেখ্য যে, গোলটেবিল বৈঠকে মওলানা ভাসানী এবং ভূট্টো কেউই যোগদান করেন নি। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত ৪ দিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে ৬-দফা দাবী ও তার সমর্থনে ঐতিহাসিক বক্তব্য তুলে ধরেন। ৬-দফার প্রতি অবিচল থাকায় রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আহূত গোলটেবিল বৈঠক বানচাল হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী বুঝলেন তার 'মুজিবর মিয়া' সত্য সত্যই জানাজা পড়ে এসেছেন। তবে দাফন করতে আরও দুই সপ্তাহ সময় লেগেছিল। বৈঠক ভেঙে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পর ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ মহাপরাক্রমশালী ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে লেখা এক চিঠির মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা দিয়ে কেটে পড়েন।

নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উপায়ন্তর না দেখে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন। এই দুই নির্বাচনেই বাংলার মানুষ একচেটিয়াভাবে ৬-দফার পক্ষে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। উভয় নির্বাচনে স্লোগান ছিল–কৃষক-শ্রমিক অস্ত্রধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর। নির্বাচনের ফলাফলে প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০ টি আসনে মধ্যে ২৯৮টি আসন পায় আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদের ফলা ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে ১৬৯টি আসনে মধ্যে ১৬৭ টি পায় আওয়ামী লীগ। এর ফলে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিতা পেয়ে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ একক ভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের যোগতা অর্জন করে।

৩ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে, আওয়ামী লীগ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেসের সামনে পালন করে ৬-দফার উপর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এর ফলে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কারও পক্ষে ৬-দফার বাইরে অবস্থান নেয়ার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ৬-দফার পক্ষে জনসাধারনের এই নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেটই পরবর্তীতে বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা নিয়ে আসে। বিশ্ববাসীর কাছে বৈধতা না থাকলে ভারত ও রাশিয়ার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসা সহজ হত না।

স্বাধিকার আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ। এ সবের উৎস ও উপাত্ত ছিল ৬-দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ৬-দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙ্গালীদের প্রতি চরম বৈষম্য মূলক আচরণ ও অবহেলার ফল।

বাঙ্গালীদের স্বার্ধীকার আদায়ের অপ্রতিরুদ্ধ ও তুমুল আন্দোলনের মাঝে এলো ৭ই মার্চ ১৯৭১। বেলা তখন ৩টা ২০ মিঃ। রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রের সামেন মঞ্চের উপর দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এলো বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হলো– "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানালেন স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী প্রশাসন বলতে সবকিছু অচল হয়ে পড়লো। কোর্ট-কাচারি, অফিস আদালত সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। বলতে গেলে সেদিন থেকেই আক্ষরিক অর্থে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশের রূপ ধারন করলো। সর্ব

স্তরে চলতে থাকলো শেখ মুজিবের নির্দেশ মতো কাজ। মূলতঃ এটাই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা।

১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের মধ্য রাত। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। ঠিক সেই সময় সামগ্রিক শক্তি নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার পিলখানায় ইপিআরদের উপর (বর্তমানে বিডিআর) এবং রাজারবাগ পুলিশ বাহিনীর উপর এবং অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সে রাতেই বন্দীকরা হয় এবং পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। সে রাত থেকেই শুরু হয়ে যায় মুক্তি যুদ্ধ। গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ। বিদ্রোহ করে বসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরা। এই সময় কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭শে মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এটা ছিল মূলত: বাংগালী সেনাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহনের একটি সু-সংবাদ যা বিভিন্ন স্থানে সামরিক ও বে-সামরিক নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে জুগিয়েছিল দুর্বার সাহস ও অনুপ্রেরণা। সেই সময়কার সেই ভয়াবহ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে মেজর জিয়ার ঘোষনাকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষনার সুবাদে দৈবাৎ হলেও জিয়াউর রহমান নামের একজন অপরিচিত মেজর বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। কিন্তু তাই বলে তার ঘোষনায় দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সেই একমাত্র স্বাধীনতার ঘোষক একথা কোন রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলতে পারেন না।

তথ্য সূত্র ঃ এম, আর, আখতার মুকুল, হারুন হাবিব - বিভিন্ন পত্রিকার ফিচার ইত্যাদি।